দ্য চিফ হুইটনেস

চীনের বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে আসা
এক তরুণীর রোমহর্ষক জবানবন্দি

আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড সিরিজ : ০৩

দ্য চিফ উইটনেস

চীনের গোপন বন্দিশালা থেকে পালিয়ে আসা
এক তরুণীর লোমহর্ষক জবানবন্দি

মূল: সায়রাগুল সাউতবেই | আলেক্সান্দ্রা ক্যাভেলিয়াস

ভাষান্তর: শাহেদ হাসান
সম্পাদনা: মোস্তফা আল হোসাইন আকিল

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা
বুকস

দ্য চিফ উইটনেস

চীনের বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে আসা
এক তরুণীর রোমহর্ষক জবানবন্দি

মূল: সায়রাগুল সাউতবেই | আলেকজান্দ্রা ক্যাভেলিয়াস
অনুবাদ: শাহেদ হাসান
সম্পাদনা: মোস্তফা আল হোসাইন আকিল
প্রচ্ছদ
খন্দকার যুবাইর
বানান সমন্বয়
আল আমিন
পৃষ্ঠাসজ্জা
শাহরিয়ার হাসান
স্বত্ব
প্রকাশক
প্রকাশক
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা
ইন্তিফাদা বুকস
পরিবেশনা
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র: দোকান নং ২১, কওমি মার্কেট (১ম তলা,)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: +৮৮০ ১৭৬৮-৮৬৪৪২৮ (সেলস)
+৮৮০ ১৭১৬৭-৯৭৫৪৯ (অফিস)
অনলাইন পরিবেশক: rokomari - wafilife
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৬০-৪-৬

মুদ্রিত মূল্য
৩৫০৳

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা **৭**
সম্পাদকের বাণী **৯**
অনুবাদকের কথা **১০**
প্রথম অধ্যায়
যে অতীত তাড়িয়ে বেড়ায় ১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়
দুঃশাসনের আগুনে বসে সোনালি দিনের স্বপ্ন ২৩
তৃতীয় অধ্যায়
শাট আপ! ৫৩
চতুর্থ অধ্যায়
বিশ্বের সবচেয়ে বড় নজরদারি রাষ্ট্র ৭৭
পঞ্চম অধ্যায়
কমিউনিস্ট পার্টির কব্জায় ৮৭
ষষ্ঠ অধ্যায়
কনসেনট্রেশন ক্যাম্প : দুনিয়ার বুকে নরক ১০৫
সপ্তম অধ্যায়
ক্যাম্পে মরার চেয়ে পালিয়ে মরা ভালো ১৩৫
অষ্টম অধ্যায়
কাজাখস্তান : প্রতিবেশী দেশে বেইজিংয়ের হস্তক্ষেপ ১৫৭
নবম অধ্যায়
বিশ্বকে জানান দেওয়া ১৭৫
শেষকথা
আলেকজান্দ্রা ক্যাভেলিয়াস ১৮৩

প্রকাশকের কথা

'আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড' সিরিজের ৩য় বই 'দ্য চিফ উইটনেস'। সিরিজের ২য় বইটি উইঘুর সমস্যা নিয়ে হওয়া সত্ত্বেও একই বিষয়ে আরেকটি বই কেন করা হলো—এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। তাই এই বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

পূর্ব তুর্কিস্তানের উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীনের ঔপনিবেশিক আগ্রাসন ও বর্বরোচিত নিধনযজ্ঞের বিষয়ে যারা কিছুমাত্রও জানেন, 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' শব্দটি সম্পর্কে তারা পরিচিত আছেন নিশ্চয়ই। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প মূলত এক ধরনের বিশেষায়িত বন্দিশালাকে বলা হয়, যেখানে কঠোর শর্তে ও ন্যূনতম মানবিক সুবিধা দিয়ে বন্দিদের রাখা হয়; এবং তাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। পূর্ব তুর্কিস্তানে উইঘুর ও কাজাখ মুসলিমদের ওপর চলমান চীনের সিস্টেমেটিক জেনোসাইড এবং জাতিগত ও সাংস্কৃতিক নিধনের প্রধান প্রতীক হয়ে উঠেছে চীনের সেসব কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দিশালা; যাকে চীন সরকার নামকরণ করেছে 'রি-অ্যাডুকেশন ক্যাম্প' বা পুনঃশিক্ষাকেন্দ্র—যা সুস্পষ্ট মিথ্যাচার।

পরিসংখ্যান মতে, চীনের এসব গোপন বন্দিশালায় ১০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ উইঘুর ও কাজাখ মুসলিমদের বন্দি করে চীনা সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার নামে পাশবিক নির্যাতন করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই শিবিরগুলোতে বন্দিরা ধর্ষণ এবং মানসিক অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। তাদের বাধ্য করা হচ্ছে নিজেদের ধর্ম, পরিচয় এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করতে। একই সঙ্গে সমাজতন্ত্র, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের প্রশংসায় মুখর হতে বাধ্য করা হচ্ছে। প্রতিদিন কল্পিত অপরাধের মিথ্যা স্বীকারোক্তি করানো এবং চীনা রাষ্ট্রের প্রশংসাগান করানো হচ্ছে চাপ প্রয়োগ করে। বন্দিদের ওপর চালানো হচ্ছে নানাবিধ মেডিকেল পরীক্ষা; এমনকি অজানা ইনজেকশনও প্রয়োগ করা হচ্ছে। নারীদের জোরপূর্বক গর্ভপাত করানো হচ্ছে, এবং পুরুষ ও নারীদের ওপর বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণের মেডিসিন প্রয়োগ করা হচ্ছে। নির্যাতন সইতে না পেরে মৃত্যুবরণ করা উইঘুরদের শরীর থেকে কেটে নেওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে চীন গড়ে তুলেছে বিশাল হিউম্যান অর্গান মার্কেট।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে হওয়া এ ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধগুলোর কথা বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ পেলেও চীন সরকার বারবারই সব অভিযোগ অস্বীকার করে গেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে চীনের বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল না। অবশেষে এই বই এবং এর

লেখিকা কাজাখ মুসলিম সায়রাগুল সাউতবে-ই একমাত্র সাক্ষী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে হওয়া এসব মানবতাবিরোধী অপরাধ নিজ চোখে দেখেছেন। ফলে এই বইটি এবং লেখিকা সায়রাগুল হয়ে উঠেছেন চীনের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রধান সাক্ষী—*দ্য চিফ উইটনেস।*

সায়রাগুল মূলত একজন কাজাখ মুসলিম, যিনি একটি অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত কাজাখ মুসলিম পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। ফলে চীনা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি পরিবারের সূত্রেই। শিক্ষাদীক্ষা শেষে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই চাকরি হয়। কিন্তু আচমকাই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হিসেবে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় কুখ্যাত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে; তবে একেবারে বন্দি হিসেবে নয়, বরং চীনা ভাষার শিক্ষক হিসেবে। তবে সেটাও কোনো অর্থেই বন্দিত্বের চেয়ে কম কিছু ছিল না। সেখানে তিনি নিজ চোখে যেসব বীভৎস দৃশ্য দেখেছেন; তা পড়ে কোনো সুস্থ মানুষ ঠিক থাকতে পারবে না। যেসব অভিযোগ চীনের বিরুদ্ধে ছিল, বাস্তবতা যে তার চেয়েও ভয়ংকর—তার সাক্ষী হয়ে ওঠেন তিনি।

অবশেষে আল্লাহর রহমতে অলৌকিকভাবে পূর্ব তুর্কিস্তানের সেই নরক থেকে পালিয়ে কাজাখস্তান চলে আসতে সমর্থ হন তিনি; যেখান থেকে কারো চোখ ফাঁকি দিয়ে একটি কাকপক্ষীও বেরুতে পারে না। কাজাখস্তানে আসার পরও কয়েকবার হত্যাচেষ্টার মুখোমুখি হন তিনি; কারণ চীনের বিরুদ্ধে কত বড় দলিল তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, তা বুঝতে ওদের সময় লাগেনি। অতঃপর বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার সাহায্যে সুইডেনে রাজনৈতিক আশ্রয় পান তিনি ও তার পরিবার এবং মানবাধিকার কর্মী আলেকজান্দ্রা ক্যাভেলিয়াস-এর সহায়তায় এই বইটি লেখার মাধ্যমে চীনের বিরুদ্ধে নিজেকে 'চিফ উইটনেস' হিসেবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন।

এই বইয়ে সায়রাগুল কেবল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তার বন্দিজীবনের গল্প বলেছেন এমন নয়। বরং নিজের জন্মের পর থেকে দেখতে থাকা পূর্ব তুর্কিস্তানে চীনা আগ্রাসনের ক্রমবর্ধমান বিস্তারের টুকরো টুকরো চিত্রগুলোও তুলে ধরেছেন। তার বলার ধরন একেবারে গল্পের মতো; ফলে শুরু করলেই পাঠক বইয়ের পাতায় হারিয়ে যাবেন নিমিষেই। আর যখন ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করবেন বইয়ের; উপলব্ধি হবে যেন গোটা শরীর ক্রমশ জমে যাচ্ছে। ক্ষণিকের জন্য নড়াচড়ার ক্ষমতাও হয়তো হারিয়ে যাবে, বাক্‌শক্তি লোপ পাবে, অজান্তেই চোখ ঝাপসা হয়ে আসবে কিংবা অশ্রুর ঢল নামবে।

চীনের পাশবিক নৃশংসতায় নিষ্পেষিত হতভাগ্য উইঘুর ও কাজাখ মুসলিমদের নিয়ে লেখা এমন একটি বই থেকে আমরা পাঠকদের বঞ্চিত করতে চাই না।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
০৭/১১/২০২৪

সম্পাদকের বাণী

সায়রাগুল সাইউতবে-এর '*দ্য চিফ উইটনেস*' আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরির সাথে তুলনীয়। আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরিতে আত্মগোপনের দুই বছরের বিভিন্ন বিবরণী উঠে এলেও সায়রাগুল সাইউতবের এই ধারাবিবরণীতে তার জন্মের পর থেকে উইঘুর অঞ্চলে চীনের নগ্ন হস্তক্ষেপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সাদামাটাভাবে তার জীবনকাহিনি বর্ণনার সাথে সাথে চীনের ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন উঠে এসেছে। তার বর্ণনা একটি সুপরিকল্পিত গণহত্যার সাক্ষী।

উইঘুর নিয়ে আমাদের আলোচনার শুরুতেই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা চলে আসে। কিন্তু রাতারাতি উইঘুর জনগোষ্ঠীকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি করা হয়নি। ধাপে ধাপে নাগরিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার সংকুচিত করার চূড়ান্ত রূপ চীনের এই আধুনিক কারাগার। তার ধারাবিবরণীতে সর্বশেষ এই কারাগারের মর্মান্তিক নিপীড়ন উঠে এসেছে। সর্বোপরি, সায়রাগুল সাইউতবের এই জবানবন্দি পাঠককে মৌলিক অধিকার আদায়ে বিশেষভাবে সচেতন করবে।

মোস্তফা আল হোসাইন আকিল
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যিনি আমাকে 'The Chief Witness: Escape from China's Modern-Day Concentration Camps' বইটি বাংলায় অনুবাদ করার তাওফিক দিয়েছেন। বইটি কেবল একটি অনুবাদ নয়; চীনের আধুনিক দাসত্বের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার এবং এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবদান রাখার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছি।

মূল লেখক সাউরাগুল সাউতবে এই বইতে নিজের হৃদয়বিদারক গল্প বর্ণনা করেছেন। তিনি ভয়াবহ চীনা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটকা পড়েন এবং আধুনিক দাসত্বের ভয়াবহ জগতে ব্যাপক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হন।

সাউরাগুল সাউতবে একজন সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে ছিলেন। পড়াশোনায় দারুণ মেধার স্বাক্ষর রেখে তিনি চীনে সরকারি পদে মোটামুটি একটি অবস্থানে পৌঁছে যান। কিন্তু তবুও কাজাখ হওয়ার অপরাধে তাকে যৌন নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন এবং অমানবিক শর্তে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। তবুও অসীম সাহসী এই নারী হাল ছেড়ে দেননি। অবিশ্বাস্য সাহস এবং দৃঢ়তার সাথে দুর্ভেদ্য চীনের বলয় থেকে তিনি পালিয়ে যাওয়ার একটি উপায় খুঁজে বের করেন। এরপর তার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিশ্বকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেন।

তার সাহসী পলায়ন, অসম শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে অবিচারের বিরুদ্ধে তার লড়াই আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

সায়রাগুলের গল্প কেবল তার নিজস্ব কষ্টের বিবরণ নয়; বরং চীনের আধুনিক দাসত্বের ব্যাপক ব্যবস্থার একটি ভয়াবহ চিত্রও অঙ্কন করেছে। চীনে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ, পুরুষ, মহিলা এবং শিশু মানবপাচার এবং নির্মম শোষণের শিকার হয়। এই বইয়ে সেই অত্যাচারের বাস্তবতা উন্মোচন করা হয়েছে এবং আমাদের সকলকে এই অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এ ব্যাপারে গাফিলতি করলে আমাদের ওপর কী দুর্যোগ নেমে আসতে পারে, সেই ব্যাপারে সতর্কও করা হয়েছে।

অনুবাদ করার সময়, আমি নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি :

সঠিকতা: আমি মূল লেখকের অর্থ এবং উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব সঠিকভাবে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি।

স্পষ্টতা: আমি সহজ এবং সরল বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছি, যাতে পাঠকরা সহজেই বইটির বিষয়বস্তু বুঝতে পারে।

আশা করি, এই অনুবাদটি চীনের আধুনিক দাসত্বের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং এই অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবদান রাখবে।

বইটির অনুবাদে ভুলত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। সেগুলো জানানোর একান্ত অনুরোধ রইল। এ ছাড়া বই-সংক্রান্ত যেকোনো মতামত আমাদের জানাতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ উইঘুরের সকল নির্যাতিত মুসলিম ভাইবোনদের ওপর সহায় হোন। আমিন।

শাহেদ হাসান
২৬শে এপ্রিল, ২০২৪
রাজশাহী

প্রথম অধ্যায়
যে অতীত তাড়িয়ে বেড়ায়

আমার নাম সায়রাগুল সাইউতবে। আমি বিবাহিতা। আমার স্বামীর নাম উয়ালি ইসলাম। আমার এক মেয়ে এবং এক ছেলে—যথাক্রমে উকিলে এবং উলাগাত। আমি আমার পরিবারকে অন্য সবকিছুর চাইতে বেশি ভালোবাসি। আমাদের বসবাস ছিল চীনের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে। এর আয়তন জার্মানি, ফ্রান্স এবং স্পেনের মোট আয়তনের চেয়েও বেশি। এটি বেইজিং থেকে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রদেশটি উঁচু উঁচু পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত, যার কোনোটি ৭০০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু। চীনের অন্য যেকোনো প্রদেশের তুলনায় এই প্রদেশের সাথে সবচেয়ে বেশি দেশের সীমান্ত রয়েছে। যেমন—মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত ও পাকিস্তান। সুদূর ইউরোপের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রদেশও এটি।

প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলটি মূলত উইঘুর জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল। তবে এখানে আরও অনেক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি রয়েছে, যেমন—মঙ্গোলিয়ান, কিরগিজ, তাতার ও চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী কাজাখ। আমিও এই কাজাখ জনগোষ্ঠীর সদস্য। ১৯৪৯ সাল অবধি আমাদের এই প্রদেশকে পূর্ব-তুর্কিস্তান বলা হতো। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকাটি 'পশ্চিমের প্রবেশদ্বার' হিসেবেও পরিচিত ছিল। কিন্তু আমাদের পাশে থাকা সুবিশাল চীনা সাম্রাজ্য জোরপূর্বক এই পুরো অঞ্চলকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। একে শিনচিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (নিউ ফ্রন্টিয়ার) হিসেবে পুনর্নামকরণ করা হলেও এখনো আমাদের কাছে এটি পূর্ব-তুর্কিস্তানই, যা চিরকালই আমাদের পৈতৃক জন্মভূমি। খাতা-কলমে বেইজিং এখানকার আদিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা ও স্বাধীন

ইচ্ছার নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু বাস্তবে আমাদের সাথে সরকারের ব্যবহার ক্রীতদাসের মতোই।

২০১৬ সাল থেকে আমাদের প্রদেশটি বিশ্বের বৃহত্তম নজরদারি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের অনুমান মোতাবেক এখানে মাটির ওপরেই ১২০০টিরও বেশি বন্দিশিবির রয়েছে। ভূগর্ভস্থ শিবিরগুলোর সংখ্যা কেউ সঠিকভাবে জানে না। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, সেগুলোর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে প্রায় ৩০ লাখ লোক এসব ক্যাম্পে বন্দি রয়েছে। তারা কোনো অপরাধের সাথে জড়িত নয়। তাদেরকে কোনোপ্রকার বিচারের সম্মুখীনও করা হয়নি। থার্ড রাইখের[১] পর কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া সবচেয়ে বড় বন্দিদশা এটি।

সিনিয়র সরকারি চাকুরিজীবী হিসেবে পূর্ব-তুর্কিস্তানের দুঃস্বপ্নময় বন্দিশিবিরের অনেক লোমহর্ষক দৃশ্য আমি দেখেছি। কিন্তু পার্টির লোকদের ভয়ে আমাকে মুখ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এর কোনো ব্যত্যয় হলে মৃত্যুই ছিল অবধারিত পরিণতি। আক্ষরিক অর্থেই আমাকে একপ্রকার নিজের মৃত্যুপরোয়ানায় স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। এত সব বাধা সত্ত্বেও আমি শেষপর্যন্ত বিশ্বের সর্ববৃহৎ উন্মুক্ত কারাগার থেকে পালিয়ে সুইডেনে পৌঁছাতে সক্ষম হই।

যেহেতু আমাকে একটি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, তাই বন্দিদের থেকে আমার পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। আমার এই অবস্থানের সুবাদে আমি সিস্টেমের ভেতরের কার্যকলাপকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। এটা মূলত নিখুঁতভাবে পরিচালিত একটি কয়েদব্যবস্থা, যা বেইজিংয়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হয়। সেখানে কেবল নিয়মতান্ত্রিক নির্যাতন, অপমান ও মগজধোলাই করা হয় না; বরং এর উদ্দেশ্য হলো একটি সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করে ফেলা।

অথচ আমরা এখানে (পশ্চিমা দেশগুলোতে) বসে আছি আর আমাদেরই বড় বড় কর্পোরেশনগুলো উত্তর-পশ্চিম চীনে ব্যাবসা করে ব্যাপক মুনাফা লুটছে। তাদের বিশাল বিশাল কর্পোরেট বিল্ডিংগুলোর অদূরেই আবালবৃদ্ধবনিতারা পশুর মতো খোঁয়াড়ে আবদ্ধ এবং অকথ্য নির্যাতনের শিকার। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, বর্তমানে আমার প্রদেশের প্রতি দশ জন মুসলমানের মধ্যে একজন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি। এই হিসাব আমার নিজের অভিজ্ঞতার সাথেও মিলে যায়। আমার ক্যাম্পে সর্বমোট ২৫০০ জন বন্দি ছিল। মঙ্গলকুর আঞ্চলিক কেন্দ্রকে চীনারা বলত ঝাওসু। সেখানে প্রায় ১,৮০,০০০ লোক বাস করে। সেখানে দুটি বিশাল কারাগার এবং তিনটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প রয়েছে। এগুলো পরিত্যক্ত বিল্ডিং এবং আগেকার

১ জার্মানিতে নাৎসিদের উত্থানকে থার্ড রাইখ (তৃতীয় রাজ্য) বলা হয়। নাৎসি জার্মানি তখন পূর্ব ইউরোপের কিছু এলাকা দখল করেছে। তারা সেখানে বিরুদ্ধাচরণকারী ও ইহুদিদের গণহারে গুলি করে হত্যা করে।

একটি পার্টি স্কুলের জায়গায় বানানো হয়েছে। যদি ধরা হয় যে, এই ক্যাম্পগুলোতেও সমসংখ্যক লোক বন্দি রয়েছে, তবে আমার কাউন্টির সমান আয়তনের ছোট জায়গাটিতেই ২০,০০০ লোককে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমার প্রদেশের প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই কেউ-না-কেউ এর ভুক্তভোগী। শিনচিয়াংয়ের প্রত্যেকেই তাদের কোনো-না-কোনো আত্মীয়কে হারিয়েছে।

চীনের এসব বন্দিশিবিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। আমাদের কাছে অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি রয়েছে, স্যাটেলাইট ইমেজ রয়েছে। সম্প্রতি একজন চীনা হুইসেলব্লোয়ার[২] 'চায়না ক্যাবলস' নামে একটি ডকুমেন্টস ফাঁস করে দিয়েছে। ফলস্বরূপ বহুকাল এসব কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অস্তিত্ব অস্বীকার করার পর বেইজিং অবশেষে কথিত 'ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সিনিয়র চীনা রাজনীতিবিদরা এই কথিত 'ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার' নিয়ে নানা মনগড়া ও বানোয়াট কথা বলে যাচ্ছে। তারা বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা সিনেমা তৈরি করেছে, যেখানে দেখা যায় শিক্ষার্থীরা সুন্দর মেক-আপ করেছে, তারা ভালো ভালো পোশাক পরে নাচছে, গাইছে আর হাসাহাসি করছে। তাদের লাইটের আলোয় উজ্জ্বল ও সুসজ্জিত কক্ষে পাঠদান করা হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে 'ভালো মানুষ' হওয়ার শিক্ষা। পার্টির অফিশিয়াল বক্তব্য হচ্ছে, 'বিদেশী মিডিয়া তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মিথ্যা ছড়াচ্ছে। এখানে যেসব ছাত্ররা রয়েছে, তারা স্বেচ্ছায় সেখানে অবস্থান করছে। আর এসব ছাত্রদের বেশির ভাগকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

এ ধরনের বক্তব্য আমাকে অবাক করে দেয়। কারণ, তাহলে আমার সমস্ত বন্ধু, প্রতিবেশী আর পরিচিতরা গেল কোথায়? তাদের মুক্তি দেওয়া হলে ফোনে কেন তাদের পাওয়া যায় না? আর এসব কথিত 'ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার'-গুলো বেইজিং কেন এত কঠোর নজরদারিতে রেখেছে? ছোট বাচ্চাদের স্কুল থেকে তুলে এনে কেন সেখানে রাখা হচ্ছে? কেন তাদেরকে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে? বোর্ডিং স্কুল কেন বাবা-মায়ের স্থান দখল করবে? চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি চাইলেই এটা হয়ে যাবে? চুরাশি বছর বয়সী বৃদ্ধার জন্য এই 'রি-অ্যাডুকেশন' কী শিক্ষা বয়ে আনবে? এসব কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তো লেখক, সফল ব্যবসায়ী, অধ্যাপকের মতো উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও আছেন। তাদের কেন কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে আরও শিক্ষা নিতে হচ্ছে?

পূর্ব-তুর্কিস্তানের এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলো নিয়ে কেউ কোনো সত্য উচ্চারণ করলেই তাকে বিদেশি গুপ্তচর, মিথ্যাবাদী বা সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। চাইনিজ সেন্সর অনলাইনের এসব তথ্য সাথে সাথে চিহ্নিত করে এবং সেগুলো ডিলিট করে দেয়। আর চীনের ভেতর থেকে কেউ এসব তথ্য ফাঁস করলে পরের

২ হুইসেলব্লোয়ার বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অবৈধ, অনৈতিক, অনিরাপদ বা প্রতারণামূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেন।

দিনই তাকে গুম হতে হয়। যখন কোনো পশ্চিমা প্রতিনিধিদল ঘোষণা করে যে, তারা পূর্ব-তুর্কিস্তান পর্যবেক্ষণ করতে আসছে, তখন চাইনিজ কর্তৃপক্ষ সাথে সাথে এসব রি-অ্যাডুকেশন ক্যাম্পগুলোকে সাধারণ স্কুলে রূপান্তর করে ফেলে। তখন আর কিছুই বোঝা যায় না। এমনটাই ঘটেছিল ২০১৯ সালে। বেড়া থেকে কাঁটাতার অদৃশ্য হয়ে যায়, ভারী সশস্ত্র প্রহরীদের গেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যে শিক্ষকদের জোরপূর্বক বন্দি করা হয়েছিল, তাদের দিয়ে রাস্তার ঝাড়ুদার বা কারখানার শ্রমিকের অভিনয় করানো হয়। শুধু পরিদর্শনের সময়কালের জন্য তাদের এই কাজ করতে বাধ্য করে কর্তৃপক্ষ। কাজাখ এবং উইঘুর শিক্ষার্থী দিয়ে পূর্ণ করা হয় নতুন ক্লাসরুম। সবকিছুকে সত্য প্রমাণিত করতে টেলিভিশনের জন্য প্রাণবন্ত কিছু ছবি তোলা হয়।

আমার একজন বন্ধু এই ঘটনার কিছুদিন পর তার মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করার অনুমতি পেয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল, পশ্চিমা দর্শনার্থীদের আগমন উপলক্ষে সকল শিক্ষক এবং ছাত্রকে পার্টির ঠিক করে দেওয়া বক্তব্য প্রদান করতে হয়েছিল। কেউ একটি শব্দ বা কমা ভুল করলে এমনকি শিক্ষকদেরও বন্দিশালায় নিক্ষেপ করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। রি-অ্যাডুকেশন ক্যাম্পের শিক্ষার্থীদের জন্য পার্টির অফিসিয়াল নির্দেশাবলি ছিল এমন— 'শিক্ষার্থীরা, বিগত কয়েক বছরে তোমাদের সাথে যা ঘটেছে সেটা বলার কথা ভুলেও ভাববে না। তোমরা ওদের বলবে, পার্টি তোমাদের সাথে কত ভালো আচরণ করে, এখানে তোমরা কত সুন্দর জীবন কাটাচ্ছ...।' পার্টির এসব নাটকের সাথে আমরা তত দিনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

অতীতের কথা ভাবলে আমি ভেতরে ভেতরে দংশিত হই। আপনা-আপনি বমি চলে আসে। মনে হয় এই দুঃসহ অতীত আমার শরীরে পরজীবীর মতো বাসা বেঁধে আছে। মাথার চারপাশে আমি ভালোভাবে স্কার্ফটা বেঁধে নিই। কারণ আমার মনে হয় এখনই যেন মাথাটা বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। হয়তো এটা দুর্বিষহ স্মৃতির জ্বালাতন বা অসহনীয় নির্যাতনের প্রভাব। কিন্তু বন্দিশালায় আমার অভিজ্ঞতা যতই রোমহর্ষক হোক না কেন, আমাকে তো তা বলতেই হবে। বিশ্বকে সতর্ক করা আমার কর্তব্য। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, আমি এই ভয়ংকর অপরাধের জন্য চীনা জনগণকে দোষারোপ করি না। এই সবকিছুর দায় সম্পূর্ণভাবে বেইজিং সরকার এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির।

এসব ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাই আমি এই ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি। আমি শুধু নিজের হয়ে কথা বলছি না; বরং এই বন্দিশিবিরে আটক থাকা সকল ব্যক্তির জন্য এবং এই স্বৈরাচারের অধীনে যারা জীবনের ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে তাদের পক্ষ হয়েও বলছি। পাঠকের উদ্দেশ্যে আমি বলব, স্বাধীনতাকে চিরন্তন মনে করা যাবে না। স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। যদি আমরা সঠিক সময়ে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কাজ না

করি, তাহলে সেই স্বাধীনতা হারাতে সামান্যতম বিলম্ব হবে না। চীন তার সকল পরিকল্পনাই দীর্ঘমেয়াদে সাজায়। বেইজিং-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাস করার বাস্তবতার সাক্ষী আমি। চীন একটি অত্যাধুনিক নজরদারি রাষ্ট্র। বিশ্ব এর নজির দ্বিতীয়টি দেখেনি। আর যে জায়গায় স্বাধীনতা নেই, সেই জায়গা নরকতুল্য।

সুইডেন ছেড়ে জার্মানির উদ্দেশে

সেইদিনের পরিস্থিতি ছিল বেশ ভিন্ন। অদ্ভুতই বলা চলে। আমি জার্নালিস্ট আলেকজান্দ্রা ক্যাভেলিয়াসের সাথে সাক্ষাৎ করতে সুইডেনে আমার পরিবারকে বিদায় জানিয়ে দশ বছর বয়সী ছেলে উলাগাতকে নিয়ে জার্মানির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম। আলেকজান্দ্রা ক্যাভেলিয়াস আমাদের কথোপকথনকে একটা বই আকারে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করছিলেন। ফেরির যাত্রা শুরু করার কথা রাত ১০টা ৫৫ মিনিটে। কিন্তু আমরা চার ঘণ্টা আগেই বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। অথচ ফেরিঘাট ছিল মাত্র ১৫ মিনিটের দূরত্বে। আমার স্বামী উয়ালি আর আমার চৌদ্দ বছরের মেয়ে উকিলেও বিদায় জানাতে আমাদের সাথে এসেছিল। কিছুক্ষণ পর তারা দুজনেই খুব চুপচাপ হয়ে গেল। তাদের চেহারায় বিমর্ষতার ছাপ ছিল স্পষ্ট।

ছেলের সাথে আমি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাসটা আমাদের ফেরিঘাটে নিয়ে যাবে। আমার জ্যাকেট টানতে টানতে উলাগাত প্রশ্ন করল, 'বাবা আর আপু আমাদের সাথে কথা বলছে না কেন?' আমি বলেছিলাম, 'হয়তো ওরা চায় না আমরা ওদের ছেড়ে চলে যাই।' সে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে বাবার কাছে গেল। 'বাবা, তুমি চাও আমরা এখানে থাকি?' আমার স্বামী উয়ালি মাথা নেড়ে ছেলেটির ঘন কালো চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'না সোনা। এটা তোমাদের জন্য এক দারুণ সুযোগ! ভেবে দেখো, তোমার বয়স মাত্র ১০ বছর। আর তুমি এখনই চারটা দেশ ভ্রমণ করতে যাচ্ছ। সব শিশুদের স্বপ্নই তো থাকে এটা। তুমি এখন বড় হয়েছ। মায়ের দেখভাল করবে তুমি। তাকে চা বানিয়ে দেবে। ওষুধ এনে দেবে।'

আমার বাচ্চারা জানে যে, আমি ক্যাম্পে থাকার সময় থেকেই অসুস্থ। সুস্থ অবস্থায় কেউ এ-রকম জায়গা থেকে বের হয় না। মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে করতে অনেকের আত্মীয়-স্বজনও অসুস্থ হয়ে পড়ে। উদ্‌বেগ তাদের গ্রাস করে নেয়। তারা নিরর্থকভাবে জীবনযাপন করে প্রিয়জনের মুখ দেখার আশায়। আমার বাচ্চারা খুব দ্রুতই বড় হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে তারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব নিতে শিখে গিয়েছিল।

বাসের অটোমেটিক দরজাটা ছেলেসহ আমাকে আমার স্বামী-কন্যা থেকে আলাদা করে দিয়ে চলতে শুরু করে। আমার মেয়েটা আমাদের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বাসটা পাঁচ গজও এগোতে পারেনি, এমন সময় আমার স্বামী আমাকে কল করে। 'কেমন আছ? সব ঠিকঠাক আছে তো? যত্ন নিয়ো নিজেদের!'

আসলে তাদের কষ্ট পাওয়ার তেমন কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু সম্ভবত পুরোনো অন্ধকার স্মৃতি আবার বুদ্‌বুদের মতো মনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তার হয়তো মনে পড়ে গিয়েছিল যে, তারা কীভাবে আমাকে সীমান্তের এপারে রেখে বাবার সাথে কাজাখস্তান পালিয়ে গিয়েছিল। আড়াই বছর আমার সাথে পরিবারের কোনো যোগাযোগ ছিল না। সেই ঘটনার পর একটা দিনও তাদের দুশ্চিন্তাবিহীন কাটেনি।

জার্মানি

আমার প্রাথমিক গন্তব্যগুলোর একটি ছিল স্টকহোমের পররাষ্ট্র দপ্তর, তারপর ব্রাসেলসের ইউরোপীয় সংসদ। সেখানে আমি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আমার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছিলাম। সম্ভবত এই বইটি প্রথমে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়ে ভালোই হয়েছে। কারণ, ফ্যাসিবাদের সাথে জার্মানির করুণ ইতিহাস রয়েছে। তবে তাদের করুণ ইতিহাস চীনের মতো নয়। তারা তাদের অন্ধকার অতীতকে মোকাবেলা করেছে সাহসের সাথে। বোঝার চেষ্টা করেছে, কেন তাদের সাথে এমনটা ঘটেছিল। এরপর তারা সেটা থেকে শিক্ষা নিয়েছে। কিন্তু চীন তার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেছে।

জার্মানিতে বাসে বা ট্রেনে থাকা অবস্থায় টিকেট চেকার এলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে হতো যে, 'ভয় পেয়ো না। উনি তোমাকে গ্রেফতার করবে না...। তুমি একজন স্বাধীন মানুষের মতোই ঘোরাফেরা করার অনুমতিপ্রাপ্ত!' আমরা সবাই মানুষ এবং একই গ্রহে একই সময়ে বাস করছি আমরা। কিন্তু আমি বিশ্বের যে অংশ থেকে এসেছি, তা সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। সেখানকার জনগণ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব-তুর্কিস্তানের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা অসম্ভব।

আমি স্বাধীনভাবে ঘরের বাইরে যেতে পারি, বা আমি নিজের বাড়িতেই নজরদারিহীন ঘুরতে পারি—এই অনুভূতির সাথে নিজেকে আমি এখনো সম্পূর্ণভাবে মানিয়ে নিতে পারিনি। এটা আমার জন্য নতুন। জীবনে প্রথমবারের মতো অনুধাবন করছি, স্বাধীনতা এবং সম্মানের সাথে বাঁচা বলতে আসলে কী বোঝায়। পূর্ব-তুর্কিস্তানে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ সরকারের নজরদারিতে থাকে। সেন্সরবিহীন বই ও ম্যাগাজিন, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যেমন ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ সেখানে নিষিদ্ধ। ইতিপূর্বে সুইডেনে কয়েক মাস থাকার পরও আমি সেই আগের অনুভূতি থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আত্মীয়-স্বজন, স্বামী-সন্তানকে নিয়ে এখনো ভেতরে ক্রমাগত ভয় কাজ করে। মাঝে মাঝে রাস্তায় এশীয় কাউকে দেখলে মনে হয়, লোকটা চীনা গোয়েন্দা না তো? সে কি আমার ওপর নজর রাখছে? কমিউনিস্ট পার্টির হাত অনেক অনেক লম্বা। এরা বিশ্বের যেকোনো জায়গায় যে-কারও কাছে পৌঁছে যেতে পারে।

পূর্ব-তুর্কিস্তানে থাকলে মনে হবে, সেখানকার লোকেরা যেন পাগলাগারদে বাস করে। সেখানে কোনো কিছুই ঠিকমতো হয় না। আপনি সব সময় চিন্তিত থাকবেন যে, আপনি কোনো ভুল করে ফেললেন না তো। চীনা কমিউনিস্টদের সামনে কোনোপ্রকার প্রশ্ন তোলার কথা কেউ কল্পনাতেও আনে না। আমি যে আজ প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পারছি, এটা আল্লাহ তাআলার এক অপার রহমত। কেন শত-সহস্র নিরপরাধ মানুষকে নির্যাতন ও হত্যা করা হচ্ছে? কীভাবে মানুষের ওপর এই ধরনের ভয়ংকর অত্যাচার করা সম্ভব? জবাব হলো, এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন কেউ নিজেদের শ্রেষ্ঠতম জাতি বলে মনে করে। চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি ও এর সাধারণ সম্পাদক শি জিনপিং এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচারই চালাচ্ছেন। আজ বিশ্বের প্রতিটি দেশ একে অপরের সাথে সংযুক্ত। তারপরও তারা এত বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনকে এড়িয়ে যাচ্ছে। বহির্বিশ্ব চীনের এই মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে আঙুল তুললেও হয়তো ভবিষ্যতে এই অবিচার থেমে যেত।

বহির্বিশ্বে সবার চোখে চীন বলতে সভ্য, উন্নত ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী একটি দেশের চিত্রই ভেসে ওঠে। এতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু রাষ্ট্রটি একইসাথে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রোপাগান্ডা মেশিন। বাইরে থেকে একে নির্ঝঞ্ঝাট, চকচকে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে চিত্রায়ণের জন্য চীন তাদের প্রোপাগান্ডা অভিযানে অঢেল পয়সা ঢালছে। একটি রাষ্ট্রের মতো দেখায়। রাষ্ট্র-চালিত মিডিয়াও সেখানে সকল তিক্ত সত্যকে চেপে রাখে। কিন্তু তবুও তা বিষ-পুঁজের মতো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তাই চীনের জনগণ জানে যে, তাদের সরকার তাদের সাথে নিয়মিতই মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমারা কি এতটুকুও বুঝতে পারছে? না কি চীনের চকচকে চিত্র তাদের অন্ধ করে দিয়েছে?

আমি আশা করি, একদিন পৃথিবীর সকলেই বেইজিং সরকারের প্রকৃত রূপ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারবে। এজন্য অন্যান্য দেশের প্রতি আমার পরামর্শ হলো, 'পূর্ব-তুর্কিস্তান থেকে আপনারা দৃষ্টি সরিয়ে নেবেন না। আপনারা এমনটা করলে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম একই পরিস্থিতির শিকার হতে পারে।' বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্যিক শক্তি চীন অন্যদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কিংবা ওপেন মার্কেটপ্লেসের ব্যাপারে অনুদার। চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির অস্বচ্ছ রাজনৈতিক জগতে সবকিছুই ঘটে নিগূঢ় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। বহির্বিশ্বের অন্যত্রও যেখানেই বেইজিংয়ের প্রভাব বাড়ছে, সেখানেই সত্যকে শ্বাসরোধ করে আগাছার মতো বেড়ে উঠতে শুরু করেছে মিথ্যা।

হুমকি এবং আশা

প্রথম প্রথম আমার পরিবার সুইডেনে নতুন বাসায় খুব একাকী বোধ করছিল। আমরা বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজন থেকে তখন বহু দূরে। তত দিনে প্রায় ৪০টি

দেশের রিপোর্টার চাইনিজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আমার অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিল। তবে আমি এই বইটিতে যতটা বিস্তারিত বলব, ইতিপূর্বে কখনও এমনটা বলিনি।

সেই সময়গুলোতে সাংবাদিকরা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতেই আমার ফোনে হুমকি দিয়ে কল আসত— 'চুপ হয়ে যাও! বাচ্চাদের কথা ভাবো!' কখনো কখনো সুইডিশ, কখনো কাজাখ আবার কখনো চীনা ভাষায় হুমকি দেওয়া হতো। প্রতিবারই সুইডিশ পুলিশ আমাদের আশ্বস্ত করত— 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই; আপনি এখন চীনে অবস্থান করছেন না। স্বাভাবিক জীবনযাপনের চেষ্টা করুন। অন্যান্য সুইডিশের মতো আপনিও একই অধিকার পাবেন। বাইরে টহলগাড়ি না দেখলেও জানবেন যে, আমরা আপনার সুরক্ষায় আছি। তবে আমরা কী করছি সেটা আপনাকে সব সময় বলতে পারব না।' এরপর যতই সময় গড়িয়েছে, আমি তত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি। তাদের বলতাম, 'যতই হুমকি দাও না কেন, আমাদের কিছুই করতে পারবে না।' এরপরও তারা আমার মনোবল ভাঙার চেষ্টা করে যেত।

সম্প্রতি আমি এক উইঘুর মহিলার ফেসবুক ওয়ালে এসব সিক্রেট পুলিশ অপারেটিভদের একজনের কমেন্টের কথা জানতে পারি, যেখানে বলা ছিল— 'এখনো সময় আছে। থেমে যাও। নাহলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ঘরের বাইরের কালো ডাস্টবিনে ফেলে রাখা হবে।' ইনি ছিলেন সেই মহিলা, যিনি 'চায়না ক্যাবলস' ফাঁস করেছিলেন। আমি তার সাহসের প্রশংসা করি। একজন চাইনিজ কর্মকর্তা গোপনে তার কাছে এসব নথি সরবরাহ করেছিলেন। পরে তিনি সেগুলো প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। বর্তমানে চীনা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর চালানো বর্বর নির্যাতনের সবচেয়ে অকাট্য এবং অবিসংবাদিত প্রমাণ এটিই। এগুলোকে অস্বীকার করার কোনো উপায়ই বেইজিংয়ের নেই।

এখনো আমার ফোনে প্রায়ই চীন থেকে হুমকি দিয়ে কল আসে। ডিসপ্লেতে ভেসে ওঠে চীনের সিকিউরিটি সার্ভিসের নম্বর। তারপরও আমি রিসিভ করে জিজ্ঞেস করি, 'আমাকে কল করছেন কেন?' কোনো এক পুরুষ কণ্ঠ উত্তর দেয়, 'এটা জানার জন্য যে আপনি কেমন আছেন। কোথায় থাকেন সেটা জানি আমি। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে তো? আপনার সন্তানেরা কেমন আছে?' আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করি। জবাব দিই, 'সবাই ভালো আছে। আমরা সুখেই আছি।' তখন ওপাশ থেকে বলা হয়, 'এত ভালো থাকলে বকবকানি বন্ধ করছেন না কেন? তোমার ভাগ্য ভালো যে এখনও জীবিত আছ। অতীতে যা ঘটেছে, সেগুলো নিয়ে কথা বলা বন্ধ করো।' উত্তরে জানাই, 'আমি কক্ষনো থামব না। যেহেতু আপনি বেইজিংয়ে আছেন, তাই দয়া করে পার্টির নেতার কাছে গিয়ে তাকে এসবকিছু বন্ধ করতে বলুন।' ওপাশের কণ্ঠ হুট করে রুক্ষ

আর ঠান্ডা হয়ে যায়। 'এক্ষুনি বকবকানি বন্ধ করো। বাচ্চাদের কথা ভাবো একবার!' তারা সব সময় কথার শেষে এটা বলে। আমি সন্তানদের নিয়ে সব সময় ভয়ে থাকি। তারা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিস।

এসব হুমকি শুনে শুনে আমার নিজেকে খুব অসহায় লাগত। ভাবতাম, এত বড় শক্তির বিরুদ্ধে আমি একা কীই-বা করতে পারব? কিন্তু আমাকে যে সত্য বলতে হবে। শুধু ক্যাম্পের বন্দিদের জন্য নয়; কাজাখস্তানে আমার অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে, তাদের প্রতিও আমি দায়বদ্ধ এসব বলার জন্য। সেখানে অনেক মানুষ মরিয়া হয়ে আছে। তাদের সন্তান, বাবা-মা, দাদা-দাদি এবং প্রতিবেশীদের অনেকেই এসব ক্যাম্পে যাওয়ার পর আর কোনোদিন ফিরে আসেনি। আমাদের প্রতিপক্ষ কতটা শক্তিশালী তা বিবেচ্য নয়। আমরা কখনোই কথা বলা বন্ধ করব না। হয়তো এভাবেই একদিন এসব অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুঃশাসনের আগুনে বসে সোনালি দিনের স্বপ্ন

সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে

১৯৭৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। সেদিন আমার ৩৯ বছর বয়সী বাবার মুখে কালো খোঁচা খোঁচা দাড়ি শোভা পাচ্ছিল। তিনি পর্দা সরিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন, আমার মা তার ভেড়ার পশমের কম্বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন। তিনি আনন্দিত গলায় বলেছিলেন, 'সে চলে এসেছে?'

আমার জন্ম পূর্ব-তুর্কিস্তান তথা শিনচিয়াংয়ের (Xinjiang Uyghur Autonomous Region) ইলি জেলার (Ili Kazakh Autonomous Prefacture) মঙ্গোলকিউর কাউন্টিতে (Mongolküre County)। এই জেলার রাজধানীর নাম ঘুলজা। পূর্ব-তুর্কিস্তানে বরফাচ্ছাদিত জমকালো পর্বতসারি থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ বালির সাগরে ঢাকা ধু-ধু মরুভূমি—সবই রয়েছে। শৈশবে আমি গ্রামের আশ্চর্য সুন্দর ঘাসে ঢাকা মাঠে, জঙ্গলে—যেখানে নেকড়েরা ঘুরে বেড়াত—সেসব জায়গায় অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছি। ঘাসাচ্ছাদিত ঔষধি তৃণভূমি আর সবুজ বিস্তৃত উপত্যকাগুলো পাহাড়ের ওপর থেকে দেখে মনে হতো, যেন সবুজ কোনো রঙেরা খেলাধুলা করছে। আমার জন্মস্থান ইলির লোকজন খুবই প্রাণবন্ত। তারা নাচ, গান ও কৌতুক উপভোগ করে। এ ছাড়া আমাদের সেখানে অসংখ্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, কবি ও প্রবীণ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাদের নিয়ে আমরা গর্ব করি। তাদের অনেকেই বিপ্লবের সময় চীনা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। আমার গ্রামের অবস্থান ছিল তিয়েনশান পর্বতমালার পাদদেশে। এই বিস্তীর্ণ পর্বতশ্রেণি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে